ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় : ১৩৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ : ১৩৫৫
তৃতীয় সংস্করণ
বৈশাখ : ১৩৫৮
পুনর্মুদ্রণ
শ্রাবণ : ১৩৫৯
পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন : ১৩৬০
পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬২

দাম : দু' টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদ-কে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সুকান্ত তার নিজের প্রথম কবিতার বই দেখে যেতে পারল না—চিরদিন আমাদের এই আক্ষেপ থেকে যাবে। সুকান্তর বই প্রকাশের ভার আমরাই গ্রহণ করেছিলাম; তাই আমাদের প্রত্যেকটা ভুলত্রুটি আজ পর্বতপ্রমাণ হয়ে স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে।

সুকান্তর মৃত্যুর কয়েকটা দিন আগের কথা আজ বড় বেশী মনে পড়ছে। এই বইয়ের সমস্ত কবিতার ছাপানো ফাইল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যখন সুকান্তর হাতে দিলাম, তখন আনন্দে উঠে বসেছিল সুকান্ত। বই তাহ'লে সত্যিই বেরোচ্ছে। আসার সময় সুকান্তকে কথা দিয়ে এসেছিলাম—বই বেরোতে আর এক সপ্তাহ। সে সপ্তাহ না যেতেই সুকান্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

নামকরণের জন্যেই বইটা বেরোতে এত দেরি হচ্ছিল। বই যখন প্রেসে দেওয়া হয়, সুকান্ত তখন শয্যাগত—বইয়ের নাম তখনও সে ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি। পরে সে এত বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, নামকরণের ভার আমাদেরই নিতে হয়। কিন্তু কোন নামই আমাদের পছন্দ হচ্ছিল না। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে যখন নাম ঠিক হ'ল, প্রচ্ছদপটও আঁকতে দেওয়া হ'ল—তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মত এল সুকান্তর মৃত্যুর খবর। তারপর বইয়ের নাম বদলে প্রথম কবিতার নামে বইয়ের নাম রাখা হ'ল 'ছাড়পত্র'।

'ছাড়পত্রে'র সমস্ত কবিতাই ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে লেখা। এ ছাড়াও, বইতে নেই এমন বহু কবিতা এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়িতে গোড়ার দিকে সেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সুকান্তর মৃত্যুর পরে তার লেখার ঝুলিতে আরও বহু অপ্রকাশিত কবিতা পাওয়া যায়। এই সংকলনের সঙ্গে সেই সমস্ত কবিতাও জুড়ে দেবার কথা হয়, কিন্তু তা করতে গেলে আরও বেশী সময় লাগবে এবং বইটাও আকারে বেশী বড় হয়ে যাবে,—এই আশঙ্কা ক'রে 'ছাড়পত্র'কে বর্তমান আকারেই বার করা এবং অন্যান্য কবিতা নিয়ে সুকান্তর দ্বিতীয় একটি কবিতা-সংগ্রহ

বার করার সিদ্ধান্ত হয়। এই অনিশ্চয়তার জন্যে বই প্রকাশে আরও বেশী বিলম্ব হয়ে গেল; 'ছাড়পত্র' প্রকাশের ব্যাপারে আমি গোড়া থেকে জড়িত ছিলাম বলেই এই বিলম্বের জন্য প্রকাশকদের পক্ষ থেকে পাঠকসমাজের কাছে ক্ষমা চাইছি।

'ছাড়পত্রে'র কবিতাগুলি রচনার কালানুক্রমে সাজানো হয় নি। পর পর সাজানোর ব্যাপারে মোটামুটি ভাবসাম্য ও ছন্দোবৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তার ফলে প্রথম দিকে বহু নতুন ও শেষের দিকে বহু পুরানো কবিতাকে স্থান দিতে হয়েছে। 'চারাগাছ', 'প্রার্থী', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'সিঁড়ি', 'সিগারেট' প্রভৃতি কবিতা সুকান্তর রোগ-শয্যায় লেখা; 'ফসলের ডাক', 'কৃষকের গান', 'এই নবান্নে, 'আঠারো বছর বয়স' প্রভৃতি কবিতা চার-পাঁচ বছর আগেকার লেখা—সুকান্তর বয়স তখন পনেরো ষোল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'প্রস্তুত', 'দুরাশার মৃত্যু', সম্ভবত তারও আগের লেখা।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে'র রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবনপ্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয়পরাজয় আর উত্থানপতনে, সুখদুঃখ আর আশানিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।

—সুকান্ত নতুন যুগের সার্থক কবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন একাত্মতা, সহজ কথা সোজাসুজি বলতে পারার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা সুকান্তর সমসাময়িক আর কোন কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও কবিত্বশক্তিতে সুকান্ত ছিল অগ্রগণ্যদের একজন। ইস্কুলের ছাত্র অবস্থায় দেশজোড়া এত বিরাট খ্যাতি বাংলার আর কোন কবির ভাগ্যেই বোধহয় জোটেনি। এই বয়সেই বিদেশে সুকান্তর একাধিক কবিতার অনুবাদ হয়েছে, তার কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সুকান্তর কবিতা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা একথা স্বীকার করবেন যে, সুকান্তর কবিতা শুধুই বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি। 'ছাড়পত্র' তাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।

কবিতার বিচিত্র কলাকৌশলে, ছন্দের আশ্চর্য দক্ষতায়, শব্দনির্বাচনের অশেষ নৈপুণ্যে এই কবিকিশোর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদেরও অভিভূত করেছে। কিন্তু আঙ্গিকের মায়ায় সুকান্ত কখনও বাঁধা পড়েনি। 'ছাড়পত্রে'র প্রথম যুগের কবিতার সঙ্গে পরের যুগের কবিতা মিলিয়ে দেখলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'ঠিকানা' কিম্বা 'বোধনে'র সঙ্গে 'প্রার্থী'র তফাৎ অনেক। 'প্রার্থী'তে এসে সুকান্ত সম্পূর্ণ একটা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। পদ্যছন্দ বর্জন ক'রে সহজ নিরাভরণ গদ্যে সে যে আকুতি প্রকাশ করেছে, তা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। 'আর উত্তাপ দিও রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে'—করুণা বা অনুকম্পার কথা নয়, জ্বলন্ত বিশ্বাসের অগ্নিগর্ভ বাণী।

সুকান্তর প্রথম দিকের কবিতায় তার জীবনদর্শন একটু বেশী রকমের প্রকট মনে হতে পারে। হয়ত অতটা স্পষ্টবাদিতা অনেকের পছন্দ হবে না। যেখানে সমাজের শত্রুদের সে নাম ক'রে ক'রে চিনিয়ে দিয়েছে, যেখানে সে সংগ্রামের অগ্নিবর্ণ পথে পাঠকদের হাত ধ'রে ডেকেছে—সেখানে কবিতার সীমানা নিয়ে মতান্তর হতে পারে। কিন্তু সুকান্তর শেষের দিকে লেখা 'খবর', 'চিল', 'প্রার্থী' প্রভৃতি কাউকেই মুগ্ধ না ক'রে পারে না। শেষোক্ত কবিতাগুলি যে অনেক বেশী গভীর, অনেক বেশী মর্মস্পর্শী—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

'ছাড়পত্রে'র কাব্যবিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, সে ক্ষমতাও আমার নেই। সুকান্তর কবিতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয়, সেইটুকুই শুধু এখানে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

সুকান্তর সেই সমস্ত অজ্ঞাতনামা বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা কষ্ট ক'রে কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। 'ছাড়পত্রে'র প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী সত্যজিৎ রায়—তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এ ছাড়াও অন্যান্য বহু বন্ধু নানাভাবে সাহায্য ক'রে বাধিত করেছেন। পরবর্তী সংস্করণ যাতে ত্রুটিহীন হ'য়ে উঠতে পারে তার জন্যে পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতা কামনা করি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অনেকদিন আগেই 'ছাড়পত্রে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। কিন্তু নানা অসুবিধার দরুণ এতদিন প্রকাশকদের পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানো সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এই সংস্করণ সম্পর্কে নতুন ক'রে কিছু বলবার নেই। কয়েকটি নতুন কবিতা এই সংস্করণে দেওয়া হ'ল—'দেশলাই কাঠি', 'সেপ্টেম্বর '৪৬' এবং পদ্য ছন্দে 'কাশ্মীর'।

যাঁরা এতদিন অধীর আগ্রহ নিয়ে 'ছাড়পত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্যে অপেক্ষা করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সু. মু.

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ছাড়পত্রে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল—এই সানন্দ ঘোষণা ছাড়া নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। তৃতীয় সংস্করণে নতুন কোন কবিতা যোগ করা হয় নি ; কিন্তু দুটি জায়গায় সামান্য সংশোধন করা হয়েছে। 'কাশ্মীর' শীর্ষক ২নং কবিতাটির শেষের দিকে 'কাশ্মীর চঞ্চল—স্রোত লক্ষ' বদলিয়ে 'কাশ্মীর আজ চঞ্চল—স্রোত লক্ষ' এবং 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' কবিতার শেষের দিকে 'আজকের কলকাতার প্রার্থনার' জায়গায় 'আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা' করা হয়েছে। তার কারণ, এই দুটি জায়গায় পড়তে গেলে আটকায়। সুকান্তর হস্তলিখিত কপি যোগাড় ক'রে উঠতে না পারায় ছাপানো কবিতার সঙ্গে মূল লেখা মিলিয়ে দেখা সম্ভব হ'ল না। যাই হ'ক আশা করা যায় আগামী সংস্করণ বার হবার আগে কবিতাটি মিলিয়ে দেখে নিঃসংশয় হওয়া যাবে।

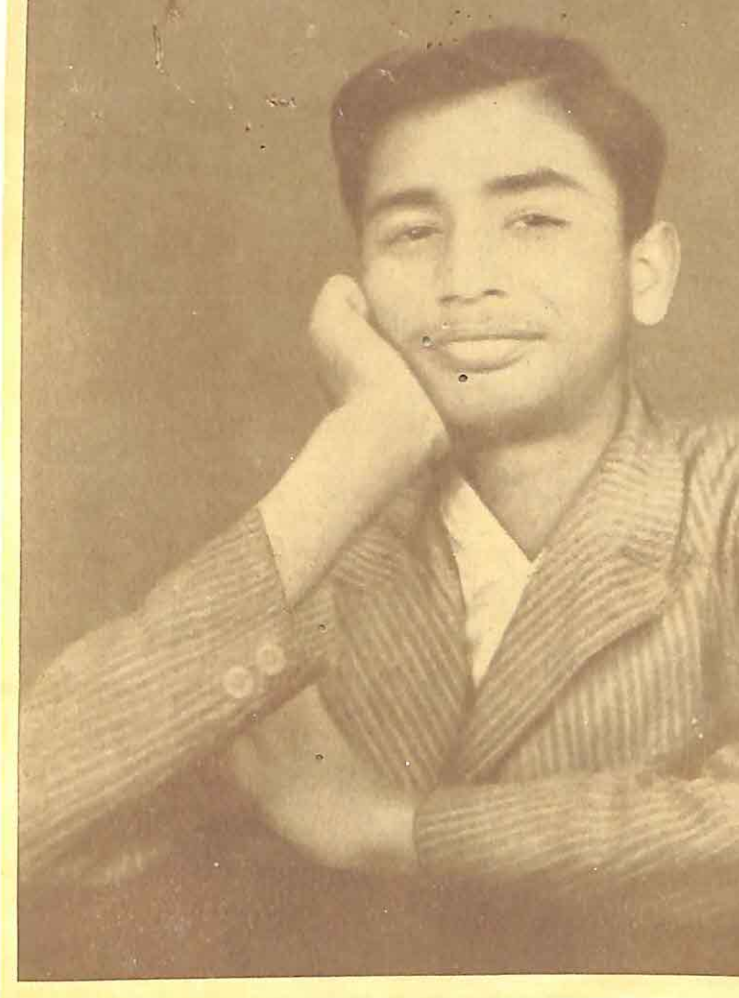
কাগজ ও ছাপার দর বৃদ্ধির দরুণ বর্তমান সংস্করণটির মূল্য সামান্য বাড়াতে হ'ল। আশা করি পাঠকেরা মার্জনা করবেন।

সু. মু.

সূচীপত্র

জন্ম : ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩

মৃত্যু : ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪



ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম :
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের—
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ
মাটিতে লালিত, ভীরু শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে।
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা
আজ শুধু অঙ্কুরিত; জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা।
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ় প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়,
অঙ্কুরিত বন্ধু যতো মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই জানি আমি ভাবী বনস্পতি
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সে দিন ছায়ায় এসো ঃ হানো যদি কঠিন কুঠারে
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেবো বারে বারে।
ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হ'য়ে উঠি—
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে
এখনো স্বগত ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি: মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।
তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি ঃ
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে ;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় ;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—
এ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে। অত্যন্ত গোপনে
ঘামের, রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতোকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সেদিন
চকিত বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্ণিশের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা !

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিলো একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
রসহীন খাদ্যহীন কার্ণিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।

হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ—
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের।

তাইতো অবাক আমি দেখি যত অশ্বত্থচারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয় এই সব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত॥

খবর

খবর আসে!
দিক্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুৎবাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝংকৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায় ;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।
অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দে শব্দেরা উঠে আসে
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
ঐ কম্পোজিটর কি চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার
কোনো ফাঁকে?
পুরোনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে?

জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ?
দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ?
যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে না কি বড়ো হরফের সম্মানে ?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।
শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি !
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।
আজ তোমরা এখনো ঘুমে॥

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার গলানো দিন,
এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নিদ্রাহীন ;
হয়তো ওখানে শুরু মন্থর দক্ষিণ হাওয়া,
এখানে বোশেখি ঝড়ের ঝাপ্টা পশ্চাৎ ধাওয়া ;
এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
কত রঙ, কত বিচিত্র নিশি দেখা দেয় এসে।
ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে প'ড়েছে কত ছেলেমেয়ে
এই বসন্তে কতো উৎসব কত গান গেয়ে।
এখানে তো ফুল শুকানো, ধূসর রঙের ধুলোয়
খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়
কঠিন রোদের ভয়ে ছেলেমেয়ে বন্ধ ঘরে,
সব চুপচাপ ঃ জাগবে হয়তো বোশেখি ঝড়ে।
অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে ;
এদেশে যুদ্ধ, মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে হাড়ে—
অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘুম কাড়ে
বেপরোয়া প্রাণ ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখ
তোমাদের দেশে মে-মাস ; এখানে ঝ'ড়ো বৈশাখ ॥

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্ত্যলোক
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে
তীব্র ভ্রূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে;
অভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে সব দিনে
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে—
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারো আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখিনি ঋণে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে;
আজকে কিন্তু জনতা জোয়ারে দোলে প্লাবন
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন
করেছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন—
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই॥

প্রার্থী

হে সূর্য ! শীতের সূর্য !
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কতো অভাব !
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কতো কষ্টে আমরা শীত আটকাই !

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক-টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিকে-ওদিকে যাই—
এক-টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য !
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
হে সূর্য !
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—

শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকে এক-একটা জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডে
পরিণত হবো,
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী॥

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেলো
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা ঃ

আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হ'য়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা ক'রলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥

সিঁড়ি

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরে তাকাও না পিছনের দিকে ;
তোমাদের পদধূলি-ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায় প্রতিদিন—

তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি।

তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হ'তে পারে পদস্খলন ॥

কলম

কলম, তুমি কতো না যুগ কতো না কাল ধ'রে
অক্ষরে অক্ষরে
গিয়েছো শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু ক'রে,
কলম, তুমি কাহিনী লেখো, তোমার কাহিনী কি?
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি?

কলম তুমি, শুধু বারংবার
আনত ক'রে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছো লিখে স্বপ্ন আর পুরানো কতো কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুধিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ জলের মতো কালি
কলম তুমি নিরপরাধ তবুও গালাগালি
খেয়েছো আর সয়েছো কতো লেখকদের ঘৃণা,
কলম তুমি চেষ্টা করো, দাঁড়াতে পারো কি না।

হে কলম! তুমি কতো ইতিহাস গিয়েছো লিখে,
লিখে লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছো চতুর্দিকে।
তবু ইতিহাস মূল্য দেবে না, এতোটুকু কোণ
দেবে না তোমায়, জেনো ইতিহাস বড়োই কৃপণ;
কতো লাঞ্ছনা, খাটুনি গিয়েছে লেখকের হাতে
ঘুমহীন চোখে অবিশ্রান্ত অজস্র রাতে।
তোমার গোপন অশ্রু তাইতো ফসল ফলায়
বহু সাহিত্য বহু কাব্যের বুকের তলায়।
তবু ত্যাখো বোধ নেই লেখকের কৃতজ্ঞতা,
কেন চ'লবে এ প্রভুর খেয়ালে, লিখবে কথা?

হে কলম ! হে লেখনী ! আর কতোদিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ ?
আর কতো মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে ?
আর, কতো আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার ?
এ দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ
কাজ করো—কাজ ।

মজুর দ্যাখোনি তুমি ? হে কলম দ্যাখোনি বেকার ?
বিদ্রোহ দ্যাখোনি তুমি ? রক্তে কিছু পাওনি শেখার ?
কতো না শতাব্দী, যুগ থেকে তুমি আজো আছ দাস,
প্রত্যেক লেখায় শুনি কেবল তোমার দীর্ঘশ্বাস !
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি
একটু অবাধ্য হলে তখনি ভ্রূকুটি ;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস ।
তাই যতো লেখো, ততো পরিশ্রম এসে হয় জড়ো :
—কলম ! বিদ্রোহ আজ ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো ।
লেখক স্তম্ভিত হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুতের পাপ ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যতো দূর দূর দেশে,
কলম ! বিদ্রোহ আজ ধর্মঘট হোক অবশেষে ;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে ॥

দুরাশার মৃত্যু

দ্বারে মৃত্যু,
বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর ?
আমাদের এই পলায়ন
জেনেছে মরণ,
অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে,
প্রস্থানের চেষ্টা হ'লো মিছে।

দাবানল !
ব্যর্থ হ'লো শুষ্ক অশ্রুজল,
বেনামী কৌশল
জেনেছে যে আরণ্যক প্রাণী
তাই শেষে নির্মূল বনানী॥

আগ্নেয়গিরি

কখনো হঠাৎ মনে হয় ঃ
আমি এক আগ্নেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো
চোখে আমার বহুদিনের তন্দ্রা।
এক বিস্ফোরণ থেকে আর এক বিস্ফোরণের মাঝখানে
আমাকে তোমরা বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছো বারংবার
আমি পাথর ঃ আমি তা সহ্য ক'রেছি।
মুখে আমার মৃদু হাসি,
বুকে আমার পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা।
সিংহের মতো আধ-বোঁজা চোখে কেবলি আমি দেখছি ঃ
মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া তোমাদের শহর,
আমাকে ঘিরে রচিত উৎসবের নির্বোধ অমরাবতী,
বিদ্রূপের হাসি আর বিদ্বেষের আতশ-বাজি—
তোমাদের নগরে মদমত্ত পূর্ণিমা।

ছাখো, ছাখো ঃ
ছায়া-ঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে ছাখো ;
ছাখো আমার নিরুদ্বিগ্ন বন্যতা।
তোমাদের সহর আমাকে বিদ্রূপ করুক,
কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্যকে করুক আহত,
কিছুতেই বিশ্বাস ক'রো না—
আমি ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার সহোদর।
তোমাদের কাছে অজ্ঞাত থাক
ভেতরে ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠা আমার অগ্ন্যুদ্গার,
অরণ্যে ঢাকা অন্তর্নিহিত উত্তাপের জ্বালা।

তোমার আকাশে ফ্যাকাশে প্রেত আলো,
বুনো পাহাড়ে মৃদু-ধোঁয়ার অবগুণ্ঠন ঃ
ও কিছু নয়, হয়তো নতুন এক মেঘদূত ঃ
উৎসব করো, উৎসব করো—
ভুলে যাও পেছনে আছে এক আগ্নেয় পাহাড়,
ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার জাগ্রত বংশধর।

আর,
আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি॥

ঠিকানা

ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি ? দুঃখ যে দিলে করবো না অভিমান ?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণ কুটির গড়ি।
আমি যাযাবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকো পথ,
তাইতো পথের নুড়িতে গ'ড়বো
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমার দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছো কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে ?
তবুও পাওনি ? তাহ'লে ফিরেছো
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।

আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কতদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।
বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
সূর্যোদয়ের ভোরে ;
পথ হারিও না আলোর আশায়
তুমি এক ভুল ক'রে।
বন্ধু, আজকে জানি অস্থির
রক্ত, নদীর জল,
নীড়ে পাখী আর সমুদ্র চঞ্চল।
বন্ধু, সময় হ'য়েছে এখনো
ঠিকানা অবজ্ঞাত
বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এতো ?
আর কতদিন দু-চক্ষু কচ্‌লাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

বন্ধু, আজকে বিদায় !
দেখেছো উঠলো যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইলো,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো ॥

লেনিন

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।
সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখে মুখে চিহ্নিত মরণ।
বিপ্লব হ'য়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।

পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;

দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন॥

অনুভব

১৯৪০

অবাক পৃথিবী! অবাক ক'রলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তা'তে;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।

১৯৪৬

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছো? শুনছো উদ্দাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দ্যাখো আজ তারা সবেগে সমুত্থিত;

তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে॥

কাশ্মীর

সেই বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই,
নেই সেই একটানা তুষার বৃষ্টি,
হঠাৎ জেগে উঠেছে—
সূর্যের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছে ভূস্বর্গ।
দু'হাতে তুষারের পর্দা সরিয়ে ফেলে
মুঠো মুঠো হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
ডেকেছে রৌদ্রকে,
ডেকেছে তুষার-উড়িয়ে-নেওয়া বৈশাখী ঝড়কে,
পৃথিবীর নন্দন কানন কাশ্মীর।

কাশ্মীরের সুন্দর মুখ কঠোর হ'লো
প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে ঃ
গ'লে গ'লে পড়ছে বরফ—
ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে জীবনের স্পন্দন ;
শ্যামল আর সমতল মাটির
স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে,
দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল ঃ
আন্দোলিত শাল, পাইন আর দেবদারুর বনে
ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি।
কাশ্মীর আজ আর জমাট-বাঁধা বরফ নয় ঃ
সূর্য-করোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে
হাজার হাজার চঞ্চল স্রোত।
তাই আজ কাল-বৈশাখীর পতাকা উড়ছে
ক্ষুব্ধ কাশ্মীরের উদ্দাম হাওয়ায় হাওয়ায় ;
দুলে দুলে উঠছে

লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে ঘুমন্ত নিস্তব্ধ
বিরাট ব্যাপ্ত হিমালয়ের বুক ॥

('কাশ্মীর' কবিতাটি প্রথমে পদ্যছন্দেই লেখা হয়। কিন্তু পদ্যছন্দে বক্তব্য যথেষ্ট জোরালো হয়ে ওঠেনি মনে ক'রে কবিতাটিকে পরে গদ্যে লেখা হয়। 'ছাড়পত্রে'র প্রথম সংস্করণে কবি নিজে বাছাই করার সময় পদ্যে-লেখা কবিতাটি বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের ভাল লাগায় দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা পদ্যে-লেখা 'কাশ্মীর' কবিতাটিও এর সঙ্গে জুড়ে দিলাম।—সু. মু.)

---

(২)

দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই
নেই আর সেই বিশ্রী তুষার-বৃষ্টি,
সূর্য ছুঁয়েছে ভূস্বর্গ চঞ্চল,
সহসা জেগেই চমকে উঠেছে দৃষ্টি।

দু'হাতে তুষার-পর্দা সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
রোদকে ডেকেছে নন্দনবন পৃথিবীর
বৈশাখী ঝড় দিয়েছে বরফ গুঁড়িয়ে।

সুন্দর মুখ কঠোর ক'রেছে কাশ্মীর—
তীক্ষ্ণ চাহনি সূর্যের উত্তাপে,
গলিত বরফে জীবনের স্পন্দন
শ্যামল মাটির স্পর্শে ও আজ কাঁপে।

সাগর-বাতাসে উড়ছে আজ ওর চুল
শাল দেবদারু পাইনের বনে ক্ষোভ,
ঝড়ের পক্ষে চূড়ান্ত সম্মতি—
কাশ্মীর নয়, জমাট বাঁধা বরফ।

কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা—
কাশ্মীর আজ চঞ্চল—স্রোত লক্ষ ঃ
দিকদিগন্তে ছুটে ছুটে চলে দুর্বার—
দুঃসহ ক্রোধে ফুলে ফুলে ওঠে বক্ষ।

মুগ্ধ হাওয়ায় উদ্দাম উঁচু কাশ্মীর—
কালবোশেখির পতাকা উড়ছে নভে,
দুলে দুলে ওঠে ঘুমন্ত হিমালয়—
বহু যুগ পরে বুঝি জাগ্রত হ'বে !

সিগারেট

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন?
আমাদের কেন নিঃশেষ করো পুড়িয়ে?
কেন এতো স্বল্প-স্থায়ী আমাদের আয়ু?
মানবতার কোন্ দোহাই তোমরা পাড়বে?

আমাদের দাম বড়ো কম এই পৃথিবীতে।
তাই কি তোমরা আমাদের শোষণ করো?
বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ফেলো পুড়িয়ে?
তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই ঃ
তোমরা নিবিড় হও আরামের উত্তাপে।

তোমাদের আরাম ঃ আমাদের মৃত্যু।
এমনি ক'রে চ'লবে আর কতোকাল?
আর কতোকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকবো
আয়ু-হরণকারী তিল তিল অপঘাতকে?

দিন আর রাত্রি—রাত্রি আর দিন ঃ
তোমরা আমাদের শোষণ ক'রছো সর্বক্ষণ—
আমাদের বিশ্রাম নেই, মজুরি নেই—
নেই কোন অল্প-মাত্রার ছুটি।

তাই, আর নয়;
আর আমরা বন্দী থাকবো না
কৌটোয় আর প্যাকেটে,

আঙুলে আর পকেটে ;
সোনা-বাঁধানো 'কেসে' আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ।
আমরা বেরিয়ে পড়বো;
সবাই একজোটে, একত্রে—
তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে
জ্বলন্ত আমরা ছিট্‌কে পড়বো তোমাদের হাত থেকে
বিছানায় অথবা কাপড়ে ;
নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো তোমাদের,
যেমন ক'রে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতোকাল ॥

দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি ;
এতো নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না ঃ
তবু জেনো
মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস ;
আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেধেছিল ?
ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন—
আমাকে অবজ্ঞা-ভরে না-নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায় !
কতো ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,
কতো প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাৎ ;
আমি একা-ই ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে।
তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের ?
মনে নেই ?   এই সেদিন—
আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাক্সে ;
চমকে উঠেছিলে—
আমরা শুনেছিলাম তোমার বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ !

আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার ;
তবু কেন বোঝো না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে,
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব—
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে—দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা তো তোমরা জানোই !
কিন্তু তোমরা তো জানো না ঃ
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই শেষ বারের মতো !

বিবৃতি

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভীড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে ব'য়ে আনে অনিবার্য মিল।

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দু'পাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।

মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ ক্রমে ক্রমে আবরণ-হীন
নিঃশব্দে ঘোষণা করে দারুণ দুর্দিন,
পথে পথে দলে দলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা চলে,
দুর্ভিক্ষ গুঞ্জন তোলে আতঙ্কিত অন্দর মহলে।
দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিস্ফল প্রার্থনা ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অন্তিম সম্বল;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে।

পরন্তু এদেশে আজ হিংস্র শত্রু আক্রমণ করে,
বিপুল মৃত্যুর স্রোত টান দেয় প্রাণের শিকড়ে,
নিয়ত অন্যায় হানে জরাগ্রস্ত বিদেশী শাসন,
ক্ষীণায়ু কোষ্ঠীতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকট-নাশন।
সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনও জীবিত,

ভারতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ—
দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উদ্ধত প্রাণের বেগে উন্মুখর আমার এ দেশ,
আমার বিধ্বস্ত প্রাণে দৃঢ়তার এসেছে নির্দেশ।

আজকে মজুর ভাই দেশময় তুচ্ছ করে প্রাণ,
কারখানায় কারখানায় তোলে ঐক্যতান।
অভুক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙলের মুখে
নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।
আজকে আসন্ন মুক্তি দূর থেকে দৃষ্টি দেয় শ্যেন,
এদেশে ভাণ্ডার ভ'রে দেবে জানি নতুন য়ুক্রেন।

নিরন্ন আমার দেশে আজ তাই উদ্ধত জেহাদ,
টলোমলো এ দুর্দিন, থরো থরো জীর্ণ বনিয়াদ।
তাই তো রক্তের স্রোতে শুনি পদধ্বনি
বিক্ষুব্ধ টাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী ঃ
বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা॥

চিল

পথ চ'লতে চ'লতে হঠাৎ দেখলাম :
ফুটপাতে এক মরা চিল !
চ'মকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ,
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিলো
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।
গম্বুজ শিখরে বাস ক'রতো এই চিল,
নিজেকে জাহির ক'রতো সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে ;
হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিতো আকাশের নীলে—
অনেককে ছাড়িয়ে ; একক :
পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে।
অনেকে আজ নিরাপদ ;
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও প'ড়ে রইলো ফুটপাতে,
শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে।
হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশ-চ্যুত এক উদ্ধত চিলকে॥

চট্টগ্রাম ঃ ১৯৪৩

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম !
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম !
এখনও নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে ; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম !

তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দূলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয়নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
তোমার সংকল্প স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম !
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম॥

মধ্যবিত্ত '৪২

পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
আজকে সকলে ভুগছে একযোগে,
এখানে খানিক তারই পূর্বাভাষ
পাচ্ছি, এখন বইছে পূব-বাতাস।
উপায় নেই যে সামলে ধ'রব হাল,
হিংস্র বাতাসে ছিঁড়লো আজকে পাল ;
গোপনে আগুন বাড়ছে ধানক্ষেতে,
বিদেশী খবরে রেখেছি কান পেতে।
সভয়ে এদেশে কাটছে রাত্রিদিন,
লুব্ধ বাজারে রুগ্ন স্বপ্নহীন।
সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে।
প্রথমে তাদের অন্ধ বীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতিপদে ;
দেখেছি সুবিধে নেই এ কাজ করায়
একক-চেষ্টা কেবলই ভুল ধরায়।
এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু রক্ত পান করে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
শাণিত-দ্বৈত-নগ্ন অন্যায়ে ;
তাদের স্বার্থ আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে একচোখে॥

সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

ক'লকাতায় শান্তি নেই।
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে,
প্রতিটি সন্ধ্যায় ;
হৃদ-স্পন্দন-ধ্বনি দ্রুত হয় :
মূর্চ্ছিত শহর
এখন গ্রামের মতো
সন্ধ্যা হ'লে জনহীন নগরের পথ ;
স্তম্ভিত আলোক-স্তম্ভ
আলো দেয় নিতান্ত সভয়ে।
কোথায় দোকান-পাট ?
কই সেই জনতার স্রোত ?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা
আজ আর তোলে নাকো
জন-তরণীর পাল
শহরের পথে।
ট্রাম নেই, বাস নেই—
সাহসী পথিক-হীন
এ শহর আতঙ্ক ছড়ায়।
সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো,
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে প'ড়ে আছে
চুপ ক'রে সভয়ে নির্জনে।
মাঝে মাঝে শব্দ হয় :
মিলিটারী-লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদম্ভ আক্রোশে!

কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে ;
হয়তো অনেক রাত্রে
পথচারী কুকুরের দল
মানুষের দেখাদেখি
স্বজাতিকে দেখে
আস্ফালন, আক্রমণ করে।
রুদ্ধশ্বাস এ শহর
ছট্‌ফট করে সারারাত—
কখন সকাল হবে ?
জীয়ন-কাঠির স্পর্শ
পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুরে ?
সন্ধ্যা থেকে প্রত্যুষের দীর্ঘকাল
প্রহরে প্রহরে
সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়
ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ ঃ
এর চেয়ে ছুরি কি নিষ্ঠুর ?
বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার
ভর ক'রে গুজবের ডানা,
উৎকর্ণ কানের কাছে
সারারাত ঘুরপাক খায়।
স্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে
কখনো বা গৃহস্থের দ্বারে
উদ্ধত, অটল আর সুগম্ভীর
শব্দ ওঠে কঠিন বুটের।

শহর মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে।

জুলাই ! জুলাই ! আবার আসুক ফিরে
আজকের ক'লকাতার এ প্রার্থনা ;

দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

অক্‌টোবরকে জুলাই হ'তেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াবো সবার পাশে,
আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে॥

ঐতিহাসিক

আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে—
পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে
তোমরা কি দেবে আমার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ :
কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভ'রলো পঞ্চাশ সাল ?
আজ বাহান্ন সালের সূচনায় কি তার উত্তর দেবে ?
জানি ! স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমাদের অগ্রগতির স্রোত,
তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো ক'রছো ভবিষ্যৎ
আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হ'চ্ছে উৎসাহের কয়লা।
কিন্তু ভেবে দেখেছো কি ?
দেরি হ'য়ে গেছে অনেক, অনেক দেরি !
লাইনে দাঁড়ানো অভ্যেস করোনি কোনোদিন,
একটি মাত্র লক্ষ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মারামারি ক'রেছো পরস্পর,
তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।
কেবল বঞ্চিত বিহ্বল বিমূঢ় জিজ্ঞাসা-ভরা চোখে
প্রত্যেকে চেয়েছো প্রত্যেকের দিকে ;
—কেন এমন হ'লো ?

একদা দুর্ভিক্ষ এলো
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন ?
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।

কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।

মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে ঃ কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার।
লাইনে দাঁড়ানো আয়ত্ত করেছে যারা,
সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স
রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি
সব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।
এখনও এই লাইনে অনেকে প্রতীক্ষমান,
প্রার্থী অনেক ; কিন্তু পরিমিত মুক্তি।
হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হ'তে পারে—
একথা ঘোষণা ক'রে দাও তোমাদের দেশময় প্রতিবেশীর কাছে।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।
আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হ'য়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি।
আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন॥

শত্রু এক

এদেশ বিপন্ন আজ জানি আজ নিরন্ন জীবন
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে কানে বাজে আর্তনাদ সুর,
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রু ঃ এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা-স্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়,
প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।
আমার হাতের স্পর্শে প্রতিদিন যন্ত্রের গর্জন,
স্মরণ করায় পণ। অবসাদ দিই বিসর্জন।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘোষণা,
সে যুদ্ধ আমার যুদ্ধ তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন জয়োন্মত্ত পাখা
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব॥

মজুরদের ঝড়

(ল্যাংষ্টন হিউজ)

এখন এই তো সময়—
কই? কোথায়? বেরিয়ে এসো ধর্মঘটভাঙা দালালরা;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদ্‌লায়,
বেরিয়ে এসো
জাহান্নমে-যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য
পরাজয় আর মৃত্যুর দূত—
বেরিয়ে এসো!
বেরিয়ে এসো শক্তিমান অর্থলোভীর দল
সংকীর্ণ গলির বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে।
গর্তের পোকারা!
এই তো তোমাদের শুভক্ষণ,
গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—
আর বেরিয়ে পড়ো ছোট ছোট সাপেরা
বড় আর মোটা সাপদের যারা ঘিরে থাকো।
সময় হ'য়েছে,
আসরফি আর পুরোনো অপমানের বদলে
সাদা যাদের পেট—
বংশগত সরীসৃপ দাঁত তারা বের করুক,
এই তো তাদের সুযোগ।
মানুষ ভালো করেই জানে
অনেক মানুষের বিরুদ্ধে একজনকে লাগানোর সেই
পুরোনো কায়দা।

সামান্য কয়েকজন লোভী
অনেক অভাবীর বিরুদ্ধে—
আর স্বাস্থ্যবানদের বিরুদ্ধে
ক্ষয়ে যাওয়ার দল।
সূর্যালোকের পথে যাদের যাত্রা
তাদের বিরুদ্ধে তাই সাপেরা।

অতীতে অবশ্য এই সাপেরা জিতেছে বহুবার।

কিন্তু এখন সেই সময়,
সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না—
বিশ্বাস ক'রো না সেই সব সাপেদের
জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে,
বিপদে প'ড়লে যারা ডাকে
তাদের চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের।
এতোটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে
যে ধর্মঘট বে-আব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন।

—অবশ্য, এখনো কোনো সম্মানিত প্রতিষ্ঠান হয়নি
যার অজ্ঞাত নাম:
"ধর্মঘট ভাঙার দল"
অন্তত দরজায় সে নাম লেখা থাকে না।

ঝড় আসছে—সেই ঝড়:
যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।
আর হুঁশিয়ার মজুর:
সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি॥

ডাক

মুখে-মৃদু-হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা
শোনো হুংকার কোটি অবরুদ্ধের।

দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও
সন্ধিপত্র মাড়াও, দু-পায়ে মাড়াও।
তিন-পতাকার মিনতি : দেবে না সাড়াও?
অসহ্য জ্বালা কোটি কোটি ক্রুদ্ধের।

ক্ষতবিক্ষত নতুন সকাল বেলা,
শেষ ক'রবো এ রক্তের হোলি খেলা,
ওঠো সোজা হ'য়ে পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা
দেখো, ভিড় দেখো স্বাধীনতা-লুব্ধের।

ফাল্গুন মাস, ঝরুক জীর্ণ পাতা
গজাক নতুন পাতারা তুলুক মাথা
নতুন দেয়াল দিকে দিকে হোক গাঁথা
জাগে বিক্ষোভ চারিপাশে ক্ষুব্ধের।

হ্রদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তাল;
তুমি কোন দলে? জিজ্ঞাসা উদ্দাম :
'গুণ্ডা'র দলে আজো লেখাওনি নাম?

বোধন

হে মহামনব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী ! আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে,
ভেবেছো সংসার-সিন্ধু কোনো মতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছো ক্ষমা, ডেকেছো নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্ত-কক্ষেতে জমায়
তাদেরি দু'পায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছো হাত ; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিস্ফল
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।

তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল করোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার ঃ
কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার ?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি ; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
দিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে।
লোভের মাথায় পদাঘাত হানো
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর
মেলো চোখ আজ ভাঙো সে ফাঁদ
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ

তোমার ফসল তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণ কাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে।
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে ?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে শোনো তা কি ?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র ?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্র ঃ

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হ'লো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার ?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবোই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপন
করবো তোকে এবার।
তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ হয়রান হ'য়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।

তেরশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিলো কি? জবাব মেলে না তার।

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়:
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দু'হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো:
হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;
তা যদি না হয়, বুঝবো তুমি তো মানুষ নও
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই॥

রানার

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চ'লেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চ'লেছে রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

রানার ! রানার !
জানা অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চ'লেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চ'লেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ।
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিট্‌মিট ক'রে চায় ;
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন, জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার, এখনো রাতের কালো।

এমনি ক'রেই জীবনের বহু বছরকে পিছে ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌছে দিয়েছে 'মেলে'
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ মাটী ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।

অনেক দুঃখে, বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে,
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হ'য়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে—
কতো সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কতো দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি প'ড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হ'য়েছে—আকাশ হ'য়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রানার? গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে',

দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি,
নেই, দেরী নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম হে রানার ॥

মৃত্যুজয়ী গান

নিয়ত দক্ষিণ হাওয়া স্তব্ধ হ'লো একদা সন্ধ্যায়
অজ্ঞাতবাসের শেষে নিদ্রাভঙ্গে নির্বীর্য জনতা
সহসা আরণ্য রাজ্যে স্তম্ভিত সভয়ে ;
নির্বায়ু মণ্ডল ক্রমে দুর্ভাবনা দৃঢ়তর করে।
দূরাগত স্বপনের কী দুর্দিন ! মহামারী অন্তরে বিক্ষোভ
সঞ্চারিত রক্তবেগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে ঃ
অবসন্ন বিলাসের সঙ্কুচিত প্রাণ।

বণিকের চোখে আজ কি দুরন্ত লোভ ঝ'রে পড়ে ঃ
মুহুর্মুহু রক্তপাতে স্বধর্ম সূচনা ;
ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।
নশ্বর পৌষ-দিন, চারিদিকে ধূর্তের সমতা
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন ;
শোকাচ্ছন্ন আমাদের সনাতন মন
পৃথিবীর সম্ভাবিত অকাল মৃত্যুতে ঃ
দুর্দিনের সমন্বয়, সম্মুখেতে অনন্ত প্রহর
দৃষ্টিপথ অন্ধকার, সন্দিহান আগামী দিনেরা।
গলিত উদ্যম তাই বৈরাগ্যের ভান
কণ্টকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।

সহসা জানালায় দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ
অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে ;
সে মিছিলে শোনা গেল
জনতার মৃত্যুজয়ী গান॥

কনভয়

হঠাৎ ধূলো উড়িয়ে ছুটে গেলো
যুদ্ধফেরৎ এক কনভয় ঃ
ক্ষেপে ওঠা পঙ্গপালের মতো
রাজপথ সচকিত করে ঃ
আগে আগে কামান উঁচিয়ে
পেছনে নিয়ে খাদ্য আর রসদের সম্ভার।
ইতিহাসের ছাত্র আমি,
জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম
ইতিহাসেরই দিকে।
সেখানেও দেখি উন্মত্ত এক কনভয়
ছুটে আসছে যুগযুগান্তরের রাজপথ বেয়ে।
সামনে ধূম-উদ্গীরণ-রত কামান ঃ
পেছনে খাদ্যশস্য আঁকড়ে ধরা জনতা
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে দেখলাম
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক
মমতা।
অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে
তারা এগিয়ে আসছে ঃ ঝলসানো কঠোর মুখে॥

ফসলের ডাক : ১৩৫১

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেবো তাতে।

শক্তির উন্মুক্ত হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ :
দু-পায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

দু-চোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌসুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক :
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় করে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ্য সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
আমার পুরানো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।
জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে ;

তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

পরাস্ত অনেক চাষী ঃ ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ
জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল পড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূর সন্ধানী
তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে!
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত ঃ

তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে॥

কৃষকের গান

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাবো ফসল
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতে ঃ
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছো কি?
(গোপনে একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেবো আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙন দুই চোখে
ধ্বংসস্রোত জনতা জীবনে ;
আমার প্রতিজ্ঞা গ'ড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ॥

এই নবান্নে

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান
পোষ পার্বণে প্রাণ কোলাহলে ভ'রবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় ঃ
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায় ;
গত হেমন্তে ম'রে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে প্রান্তরে খামারে ম'রেছে যত পরিজন ;
নিজের হাতের জমি ধানবোনা
বৃথাই ধূলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কা'রোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে ঃ কোথায় আপন জন ?
তারা কি কেবল লুকানো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ ক'রেছে উচ্চারণ ?

এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ ?

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়
আঠারো বছয় বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত ; একে একে হয় জড়ো,

এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥

